Available online at http://www.ijims.com
ISSN: 2348 – 0343

Rivers in Bengali Novels

বাংলা সাহিত্যে নদী

Madhuri Nath

Assistant Teacher, Sambalpur Anchal High School ,Malda, West Bengal, India

Abstract

Bengal is a state of rivers so it is quite obvious that river will play a significant role in the lives of Bengal. Actually river has soaked and absorbed the life ,culture and the heritage of Bengal. The literary figures ,while writing , have been greatly influenced by the river and the essence of which has greatly been visible in their numerous writings .Some of the great novels , which deal with river and their influence on human fate , are Manik Bandyapadhyay's 'Padma Nadir Majhi' , Adyaita Mallaya Barman's 'Titas Ekti Nadir Naam' and Samaresh Bass's 'Ganga' . The main purpose to select these three novels amidist the huge collection of novels or novelas ,is , though the three novels deal with three different rivers , yet they are unique at their own essence as they show the continuos dependence of the fishermen on those rivers for their existence as much as the rivers became the controller and the manipulator human fate.'Padma Nadir Majhi' deals with the liver of the fishermen who live on the bank of the river 'Padma'. Though their lives fully depend on the river but they can never be certain of their food security .At last they are compelled to go to the 'Maina Island ', an imaginative utopian island of Husain Mia . The different day to day complexities of the fishermen's lives are captured through the unique vision of Manik Bandyapadhyay. On the otherhand , Adyaita Malla Barman , being a member of the 'Malo community' has realized the suffering , fustration and experience of being exploited of those people . The civilization , that throngs around the river , 'Titas ', gradually evacuated as the river gets dry . The fishermen are forced to seek for another means for their survival , that is cultivation , but again they are defeated by the peasant class . The novel ends with a hope that their suffering can only be dissolved if they are educated. Samaresh Basu's 'Ganga' is centred around 'Ganga ', the sacred river of Bengal . It also deals with the fishermen community and the brokers .It portrays how the fishermen risk their lives in the 'Ganga' and listen to the un ignorable call of the sea for their survival. They must have to go , even Bilas ,the protagonist could not ignore it .

Key words: manipulator , suffering, utopia , throngs , evacuate , cultivation , protagonist .

Article

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' ১৯৩৬প্রকাশিত হয় । একই বছরে লেখা 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় যেখানে অন্তর্বাস্তবতাকে তুলে ধরলেন ,একই সময়ে 'পদ্মানদীর মাঝি'তে সেই সঙ্গে বহির্বাস্তবতা হাত ধরেছে ।মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পরিচ্ছন্ন স্থানিকতা নিয়ে কাজ করেছেন ।কেতুপুর গ্রাম ,সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি নদী তীরের ছোটবড় পল্লী কয়েক ক্রোশ দূরের শহর গঞ্জ আমিনবাড়ি। পদ্মা ধরে নৌকায় নোয়াখালি,মোহনা ,বাহির সমুদ্র,চেনা বা শোনা নাম ,না চেনা নাম,না জানা দ্বীপ ।কতগুলি নাম ভৌগোলিক ,বাকি নাম সত্য বা কাল্পনিক দুইই হতে পারে।পদ্মানদীর এতখানি জায়গা জুড়ে অবস্থান নদীর সঙ্গে প্রকৃতি ও মানুষের সহজ জটিল নানা বর্ণের নানা ধরণের ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমগ্র উপন্যাস জুড়ে বিরাজ করছে। উপন্যাসের উপজীব্য হচ্ছে ''জীবনের স্বাদ এখানে ক্ষুধা ও পিপাসায়,কাম ও মমতায় ,স্বার্থ ও সংকীর্ণতায় আর

দেশী মদে, তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয় ।ঈশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে।এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না''১।এই বঞ্চনাই পদ্মাতীরবর্তী কুবেরদের জীবনের দিনলিপি।কুবের পদ্মার রূপে মোহিত হয়ে পড়ে নদীকে সে বড় ভালোবাসে , 'নদীর বুকে ভাসিয়া চলার মত সুখ আর নাই'।২ ঔপন্যাসিক খানিকটা রোমান্টিক হয়ে পড়লে কঠিন বাস্তবতা তাঁকে বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনে।

সন্ধ্যার সময় জাহাজঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ।জেলে নৌকার আলো ওগুলি। সমস্ত রাত্রি আলোগুলি এমনিভাবে নদীবক্ষের রহস্যময় অন্ধকারে দুর্বোধ্য সংকেতের মত সঞ্চালিত হয়। ...নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত সাদা ইলিশ মাছ।লণ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চকচক করে ,মাছের নিষ্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মত দেখায়।৩

ঔপন্যাসিক উল্লেখ করেছেন কুবের নদীকে বড় ভালোবসে । কিন্তু এই পদ্মাই যে তাদের সারাবছর সচ্ছল রাখে তাও নয় । বর্ষার মধ্যেই কুবেরদের মত দরিদ্র মাঝিদের সারাবছরের বাঁচার রসদ জমা করতে হয়।সারাবছরের আয়ের জন্য পদ্মার ওপরেই তাদের নির্ভর করতে হয়।তবু কখনো কখনো পদ্মাও যেন কৃপণ হয়ে পড়ে।তাদেরকে প্রকৃতি নামক ভাগ্যদেবতাই যে বিড়ম্বিত করে তাই নয় ,সেই সঙ্গে তিনখানা নৌকার মালিক ধনঞ্জয়ও তাদের ভাগ্য নিম্নগতির দিকে ঠেলে দেয় মাছের হিসেবে ভুল গণনা করে।গণেশ তুলনায় বোকা বলে ধনঞ্জয়ের একটা নৌকা ডুবে গেলে ধনঞ্জয় গণেশকে মাঝি রাখতে চায় কুবেরকে বাদ দিয়ে । কিন্তু গণেশ অন্তত কুবেরকে প্রতারণা করে না ।শুধু জীবিকার দুর্ভাবনায় পদ্মা তীরবর্তী মাঝিদের জীবনে দুর্ভোগ নেমে আসে তাই নয় ।কুবেরের সুন্দরী স্ত্রী মালা মেজকর্তার সন্তানের মা হয় সুন্দর ফর্সা সন্তানের জন্ম দিয়ে । কুবেরের স্ত্রী মালার বোন কপিলার প্রতি কুবেরের আগ্রহ।যদিও পরোক্ষভাবে কপিলাই আকৃষ্ট করেছে কুবেরকে তবু এই সম্পর্কের জটিলতায় কুবেরের মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করে না –কিন্তু মালার কাছে কপিলা মুক্তারবাবুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল জানালে লজ্জাবোধ করে। কপিলার স্বামী শ্যামাদাসের দ্বিতীয় স্ত্রী মারা গেলে তার স্বামী শ্বশুর বাড়ি থেকে নিতে আসে ।এই কপিলাই শীতলবাবুর সাথে হেসে কথা বললে কুবের তা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারে না।মানসিক যন্ত্রণাতেও ভুগেছে কুবের।শীতলবাবু কমদামে মাছ কিনে (কুবেরের চুরি করা মাছ)কুবেরকে ঠকায়।জীবন সংগ্রামে বিধ্বস্ত কুবেরকে ঔপন্যাসিক কপিলার সঙ্গে ময়নাদ্বীপে পাঠিয়ে কি একটু স্বস্তি দিতে চেয়েছেন? নদী সম্পর্কে ঔপন্যাসিক যে উচ্ছ্বাস কুবেরের চোখে অঙ্কণ করলেন কুবেরের অনুভূতি এত গভীর হওয়া কি সম্ভব?কুবেরের

তীরের দিকে চাহিয়া মনে হয় জলের সীমার মাটির তীরভূমিও বুঝি লঘুগতিতে চলিয়াছে পেছনে ।নদী ছাড়া সবই বাহুল্য ।আকাশের রঙ্গিন মেঘ ও ভাসমান পাখি , ভাঙ্গন ধরা তীরে শুভ্র আকাশ ও শ্যামল তরু,নদীর বুকে জীবনের স্পন্দন এসব কিছুই যদি না থাকে ,শুধু এই বিশাল একাভিমুখী স্রোতকে পদ্মার ভালবাসিবে সারাজীবন ।মানবী প্রিয়ার যৌবন চলিয়া যায় ,পদ্মা তো চিরযৌবনা । বচিত্র ? কি তার প্রয়োজন? নতুন পৃথিবীকে কে খোজে , কে চায় পদ্মার রূপের পরিবর্তন,শুধু ভাসিয়া চলার অতিরিক্ত মোহ? ৪

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানবী প্রিয়ার যৌবনের সঙ্গে এই যে পদ্মার যৌবনের তুলনা করে বলেছেন পদ্মার রঊপের পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই ,মানবী প্রিয়ারও কি রূপের পরিবর্তন মানুষের মননে গ্রহণযোগ্য নয়? পারস্পরিক বোঝাপড়ার মূল্য তাহলে কি? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানব মনের রসয়ানাগারে যে পরীক্ষা করলেন এবং যে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তাতে ভালবাসা শুধু শারীরিক মনন সঞ্জাত তো নয়।সে জন্যই তিনি 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় কুসুমকে দিয়ে বলান তপ্ত লোহাও ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে যায়। আর শশীকে উপস্থাপন করেন ভালবাসার এক ঊর্ধ্বলোকের প্রতিভূ রূপে তাই শশী কুসুমকে বলতে পারে "তোমার মন নাই কুসুম।''৫ তাহলে শিক্ষিত শশীর মন দেহোত্তীর্ণ ভালবাসায় স্বীকৃতি দিয়েছে ।অশিক্ষিত কুসুমের প্রেম শরীর কেন্দ্রিক।উচ্চবর্গের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নবর্গীয়দের জীবনের মতই দেহকে সহজ লভ্য হৃদয়কে সরল সাদামাটা করে অঙ্কণ করতে চাইলেন।

ধীবরপল্লী ও কেতুপুরের জনপদ জীবনই 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের প্রায় সবটুকু জুড়ে আছে ।উপন্যাসের শেষপর্বে এসেছে হোসেন মিঞার ময়নাদ্বীপের প্রসঙ্গটি ।সমুদ্র পরিবেষ্টিত সে নির্জন দ্বীপটি পদ্মার মাঝি জেলে জনপদবাসীদের কল্পনার যুগপদ আশা আশঙ্কার এক অদ্ভুত আলেয়া । রহস্যাবৃত হোসেন মিয়ার মতই রহস্যমন্ডিত ময়নাদ্বীপ যা দূরবর্তী অগ্নিশিখার মতো আকর্ষণ করা পদ্মার পাড়ে বাস করা সরল ,অশিক্ষিত মানুষদের প্রলুব্ধ পতঙ্গের মতো তারা ঝাঁপ দিতে চায় সেই অগ্নিসংকেতের ভয়াবহ রমণীয়তায়। হোসেন ও তার ময়নাদ্বীপ পদ্মানদীর মাঝি কুবেরের জীবনে আবির্ভূত হয় মূর্তিমান নিয়তি রূপে । পদ্মার বিস্তার ও তার তীরবর্তী অসংখ্য মানুষের জীবনের পরিপূরক যেন এই আদিম দ্বীপখন্ড 'ময়নাদ্বীপ'_ যাকে ভাষার সজীবতা ও বর্ণনার অনুপুঙ্খে মানিক দিয়েছেন অসম্ভব এক বিশ্বাস্যতা ।উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলের উপভাষা ব্যবহার করেছেন লেখক ।একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের দৃঢ়পিনদ্ধ রূপ উপভাষার মিশ্রণের ফলে গড়ে উঠতে পারে নি । সেদিক থেকে এই উপন্যাসের ভাষা সংকীর্ণ অর্থে আঞ্চলিক নয় ।কুবের –মালা –কপিলা –রাসু- পীতম-আমিনুদ্দিরা কথা বলে ঢাকা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের ভাষায় ।আবার হোসেন মিয়া নোয়াখালির মানুষ হওয়ায় নোয়াখালি,চট্টগ্রাম ,কখনো বিচিত্র মিশ্র উপভাষায় কথা বলেছে ।কেতুপুর থেকে ময়নাদ্বীপ পর্যন্ত এই উপন্যাসের বিস্তারের পাশাপাশি কুবেরের ভাষা থেকে হোসেন মিয়ার ভাষা মানুষের ভাব প্রকাশের সীমানাকে সম্প্রসারিত করে তোলে ।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে ঔপন্যাসে অদ্বৈতমল্ল বর্মণ নদীটিকে বলেছেন চলমান মন্থর নদী ও তার পার্শ্ববর্তী বসবাস করা মালোপাড়ার মানুষদের জীবন ও অস্তিত্ব রক্ষার সংকট অসম্ভব কাব্যময় করে করে ফুটিয়ে তুলেছেন । নদীটি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ''তিতাস কত শান্ত ।তিতাসের বুকে ঝড় তুফানের রাতেও স্বামী –পুত্রদের পাঠাইয়া ভয় করে না ।বউরা মনে করে স্বামীরা তাদের বাহুর বাঁধনেই আছে , মায়েরা ভাবে ছেলেরা মায়েরই বুকে মাথা এলাইয়া দিয়া শান্তমনে মাছ-ভরা জাল গুটাইতেছে ।''৫ বাংলার বুকে জটার মত নদীর প্যাঁচ ।সাদা ঢেউ –তোলা জটাগুলো যেন কোন মহাস্থবিরের চুম্বন-রস –সিক্ত বাংলা । তার জটাগুলো তার বুকের তারুণ্যের উপর দিয়ে সাপ খেলানো জটিলতা জাগিয়ে নিম্নাঙ্গের দিকে সরে পড়েছে । এ সবই নদী । সবগুলি নদীর রূপ এক নয় ।নদীগুলোর ব্যবহার এবং নদীর সঙ্গে মানুষের ব্যবহার তাও বিভিন্ন রকমের ।

সবগুলো নদীই মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে কাজে আসে । কিন্তু এ কাজে আসার নানা ব্যতিক্রম আছে । বড় নদীতে সওদাগরের নৌকা আসে পাল উড়িয়ে , তার বিশাল বুকে জেলেরা সারাদিন নৌকা নিয়ে ভেসে থাকে । নৌকায় রাঁধে ,খায়,ঘুমায় ,মাছ ধরে ।বড় নদীর ঢেউয়ের আঘাতে তীরগুলি ভেঙ্গে খসে পড়ে ।ক্ষমা নাই । ভাঙ্গা গড়ার এক রুদ্র দোলার দোলনায় –করাল এক চিত্তচঞ্চল ক্ষিপ্ত –আনন্দ-সে-ই একধরনের শিল্প । শিল্পের আর একটি দিক আছে । সৌম্যশান্ত করুণ প্রসাদগুণের মাধুর্যে রঞ্জিত এ শিল্প । এ শিল্পের শিল্পী মহাকালের তান্ডবনৃত্য আঁকতে পারে না । পিঙ্গল জটার বাঁধন খসে পড়ার প্রচন্ডতা এ শিল্পীর তুলিতে ধরা দেবে না । এ শিল্পের শিল্পী মেঘনা ,পদ্মা ধলেশ্বরীর তীর ছেড়ে তিতাসের তীরে আঙ্গিনা রচনা করেছে ।এ শিল্পী যে ছবি আঁকে তা বড় মনোরম ।এর তীর ঘেঁষে ছোট ছোট সব পল্লী । মা তার নাদুস নাদুস ছেলেকে ডুবিয়ে চুবিয়ে তোলে । বৌ-ঝিরা সব কলসী নিয়ে ডুব দেয় । পরক্ষণে ভেসে ওঠে । অর্থাৎ তিতাস নদীকে নিয়ে কোন দুশ্চিন্তার ভাঁজ কারো কপালে দেখি না । এভাবেই ঔপন্যাসিক উপন্যাসটিকে উপস্থাপন করেছেন পাঠকের কাছে ।

মোট আটটি অধ্যায়ে উপন্যাসটি সম্পূর্ন । চারটি খন্ডের প্রতিটি অধ্যায়ের নাম যথাক্রমে 'তিতাস একটি নদীর নাম' , 'প্রবাসখন্ড' , 'নয়াবসত' , 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' ,'রামধনু' ,রাঙা নাও' ,'দূরঙা প্রজাপতি' , 'ভাসমান' । কাহিনী প্রসঙ্গে তিতাসের তেরো মেইল দূরের বিজয় নদীর কথাও এসেছে । কাহিনীর প্রয়োজনে বিজয় নদীর পাড়ের বাসিন্দা নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গের কথা এসেছে । যারা কাহিনীর মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করেছে । মালো সম্প্রদায়ভুক্ত ঔপন্যাসিক মালোদের জীবনের সামাজিক রীতিনীতি , পূজাপদ্ধতি ,মেয়েদের ব্রত রাখার কথা এমনকি দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একেবারে সহজ –সরল বাস্তব এক চিত্র তুলে ধরেছেন । মালোদের সামগ্রিক জীবন তথা তিতাসের দেহে চ্র পড়ার ফলে তাদের জীবন সংকট , বেঁচে থাকার লড়াই জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে উপন্যাসে । শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যাআয় উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছেন ''উপন্যাসটির গঠন নির্দোষ নহে ।.....উহার ঘটনা পরিণতিও নানা বিচ্ছিন্ন, কিন্তু এক ভাবসূত্রগ্রথিত আখ্যানের যোগফল , কোন বিশেষ চরিত্রের অনিবার্য ক্রমবিকাশাভিমুখী নহে।''৬ তাঁর এই মন্তব্যকে সামনে রেখে উপন্যাসের কাহিনী পরম্পরার মধয দিয়ে উপন্যাসটি আলোচনার চেষ্টা করব । তিতাসের পাড়ের মালোরা এ মালোরা নদীর উৎপত্তি কাল জানে না , জানতে চায়ও না –তাদের কাছে এর অস্তিত্ব চির সত্য ,চিরসঙ্গী ।নামটি তাদের কাছে মিঠা । তাকে তারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে । তাই এই নামের মালা তাদের গলায় ঝুলানো । ঔপন্যাসিকের মতে নদীর একটা দার্শনিক রূপ আছে ।''নদী বহিয়া চলে; কাল ও বহিয়া চলে । কালের হার শেষ নাই । নদীরও বহার শেষ নাই । কতকাল ধরিয়া কাল নিরবচ্ছিন্নভাবে বহিয়াছে । তার বুকে কত ঘটনা ঘটিয়াছে । কত মানুষ মরিয়াছে ।''৭ আবার এ নদী দেখেছে কত শিশুর জন্ম । দেখেছে আর ভেবেছে এই অজ্ঞ শিশুগুলি জানে না , ''হাসির নামে কত বিষাদ ,সুখের নামে কত ব্যথা, মধুর নামে কত বিষ তাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে ।''৮ লেখক জানাচ্ছেন নিম্নবিত্তের মালোরা কখনো দেয়ালঘেরা বাড়ি ,বাড়ির পাশের পুষ্করিণী বা কুয়া এমনকি শহরে যাবার পথের নিশানাও দেখতে পায় না । পুঁথির পাতায় গর্ব করে লেখায় মত কোন ইতিহাস না থাকলেও যা আছে এ নদীর তা হল এর পাড়ের মানুষের মধ্যে মায়ের স্নেহ ,ভাইএর প্রেম ,বউ –ঝিয়েদের

দরদের অনেক ইতিহাস । শীতকালে তিতাসের জল একটু উষ্ণ মনে হয় । এখানে লেখক একটি সুন্দর উপমা ব্যভার করেছেন তা হ'ল ''কাঁথার নীচের মায়ের বুকের উষ্ণতার দোসর এই মৃদু উষ্ণতাটুকু না পাইলে তারা যে কি করিত ।''৯ শরতে আকাশের মেঘে জল থাকে না । কিন্তু তিতাসের বুকে থাকে ভরা জল ।তার তীরের ডুবো মাঠময়দানে সাপলা-শালুকের ফুল নিয়ে লম্বা লতানে ঘাস নিয়ে ,আর বাড়ন্ত বর্ষাল ধান নিয়ে থাকে অনেক জল । ধানগাছ আর সাপলা শালুকের লতাগুলির অনেক রহস্য নিবিড় করে রেখে এ জল আরও কিছুকাল স্তব্ধ হয়ে থাকে ।তারপর শরৎ শেষ হয়ে গেলে কে যেন বিরাট চুমুকে জল শুষতে থাকে । বাড়তি জল শুকিয়ে গিয়ে তিতাস তার স্বাভাবিক রূপ ফিরে পায় । যে মাটি একদিন অথৈ জলের নীচে থেকে মাখনের মত নরম হয়ে গিয়েছিল ,সে মাটি আবার কঠিন হয় –আসে হেমন্ত । আর হেমন্তে চাষীরা ফসল ঘরে তোলে । আবার মাঘের গোড়ায় চাষীরা তিতাসের তীরে তীরে সর্ষে বেগুনের চারা লাগায় । উপন্যাসের সূচনায় তিতাস তার পাড়ের চাষীদের মুখেই রেখেছে । কিন্তু সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ির সারাবছরের নিযুক্ত মুনীসরা কিন্তু তাদের স্ত্রীকে সুখে রাখতে পারে না । তাই মনিবের বাড়িতে মাছ-ভাত খেয়ে বিমর্ষ হয়ে আক্ষেপ করে এভাবে-''আমি ছিড়া খাঁথায় গাও এলাইয়া দিয়া পথের পানে চাইয়া থাকি । সে তখন পরের বাড়ি খাঁথা সিলাই করে ,আর সে সূঁইচের ফোঁড় আমার বুকে আইয়া বিন্ধে ।তার আইতে আইতে রাইত গফীন হয়-আগ –আন্ধাইয়া রাইত –দেখি আন্ধাইর গিয়া চাঁদ উঠছে- ভাঙা বেড়ার ফাঁকে দিয়া রোশনি ঢুকে, কেডায় যেমুন ফক ফক কইরা হাসে । ''৯

তিতাস নদীর তীরে মালোদের বাস । ঘাটে বাঁধা নৌকা ,মাটিতে ছড়ানো জাল, উঠানের কোণে গাবের মটকি , ঘরে ঘরে চরকি ,টেকো ,তকলি –সুতা কাটার, জাল বোনার সরঞ্জাম । এ সব নিয়েই মালোদের সংসার ।মাঘ মাসে কুমারী মেয়েদের 'মাঘমন্ডলের ব্রত' পালনের মধ্য দিয়ে বাঙালি নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে প্রচলিত ব্রতকথার কথা স্মরণ করান লেখক ।পুজার নিয়ম ,মন্ত্র ও পালনীয় বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে লেখক এই সমাজের এক বাস্তব জীবন্ত চিত্র তুলে ধরেছেন ।''লও লও সুরুজ ঠাকুর লও ঝুটার জল ,মাপিয়া জুখিয়া দিব সপ্ত আঁজল ।''১০ দীননাথ মালোর মেয়ে বাসন্তীর ব্রতের চৌয়ারি বানানোর প্রসঙ্গে এসে প্রবেশ করেছে কিশোর ও সুবল । সুবলের 'বাপ' গগণ মালো সারাজীবন অন্যের নৌকার জাল বাহিয়া জীবন অতিবাহিত করেছে তাই মৃত্যুকালে ছেলের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারেনি । কিশোর তার চেয়ে তিন বছরের বড় কিন্তু সুবলের আবাল্য বন্ধু ।তাদের সমাজে পাঠশালায় বিশেষ কেউ যায় না । কিন্তু তাদের বাপেরা তাদের পাঠশালায় পাঠিয়েছিল । শিক্ষকের কাকা বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী সেজে কিশোর সুবল্কে বলেছিল ''হেই সুবলা দেখ , আমি বৈকুণ্ঠ চক্রপত্তি আমারে তুই ভক্তি দে।''১১ অন্যান্য জাতির কাছে জোর করে শ্রদ্ধা আদায় করার ব্রাহ্মণদের এই রীতিকে লেখক ব্যঙ্গ করলেন কি ? মালোদের অফুরন্ত চাহিদা মেটাতে গিয়ে তিতাস ক্লান্ত হয়ে পড়ল । তারা জগৎপুরের ডহরে গিয়েও মাছ পেল না । জান বাঁচাতে দুজনে মিলে উত্তরে গেল সঙ্গে প্রবীণ জেলে তিলকচাঁদ । শুকদেবপুরের গ্রামের উজানিনগরের খলায় মাছ ধরতে যায়। কিশোর ,সুবল ও তিলকচাঁদ প্রবাসে যাত্রা করল । তিতাস গিয়ে মেঘনায় মিলেছে । কিশোর উপলব্ধি করল মেঘনার বিশালত্ব ও অতলস্পর্শী কালো জলকে । তারা দেখে ভৈরবের ঘাটের মালোরা জামা জুতা ভাড়া করে রেল-বাবুদের বাড়ির কাছ দিয়ে যাতায়াত করে ,রেলবাবুরা তাদের শিক্ষিত হবার পরামর্শ দেয় । তিলকদের ভয় শিক্ষিত হ'লে মালোদের আর বিয়ে

শাদি হবে না নদীর উদার রূপ কিশোরকে রোমান্টিক করে তোলে । সে গান গায় । যা দৃষ্টির বাইরে তারই হাতছানির মায়ায় মাঝি সম্প্রদায় বিপদে পা দেয় । নদীর উদাসী হাওয়ার পরিবেশ মাঝিদের বোহেমিয়ান করে , মাছ ধরার নেশায় সাময়িকভাবে তারা ভুলে যায় পরিবারের কথা –নিকট-আত্মীয়ের কথা । হিন্দু সমাজের গুরুকরণ প্রথার মধ্য দিয়ে এক নিগূঢ় বৈষ্ণবতত্ত্ব লেখক তুলে ধরেছেন----

শাস্ত্রে কয় বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত মদনমোহন । বিবর্তবিলাসের কথা । সে হইল নিত্যবৃন্দাবনের কথা । তিনি লীলা বৃন্দাবনে আইসা সুবলদি সখা আর ললিতাদি সখীসহ আদ্যাশক্তি শ্রীমিতি রাধিকারে লইয়া লীলা কইরা গেছেন । সেই লীলা-বৃন্দাবনে অখন আর তানরা নাই আছেন নিত্যবৃন্দাবনে । সেই নিত্যবৃন্দাবন আছে এই দেহেরই মধ্যে ।তবেই দেখ তানরা এই দেহের মধ্যেই বিরাজ করে । তারপর নদীয়া নগরের প্রভু গৌরাঙ-অবতারের কথাখান ভাব না কেনে । পদকর্তা কইছে 'আছে মানুষ গ সই ,আছে মানুষ গওরচান্দের ঘরে , নিগূঢ় বৃন্দাবনে গ সই ,আছে মানুষ । এক মানুষ বৈকুণ্ঠবাসী ।আরেক মানুষ কালোশশী , আরেক মানুষ গ সই , দেহের মাইঝে রসের কেলি করে – নিগূঢ় বৃন্দাবনে গ সই আছে মানুষ .১২

মাঝি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধরনের গান গাওয়ার অভ্যেস তাদের পরিশ্রমকে খানিকটা লাঘব করে আনন্দের সন্ধান দেয় । এগুলির মধ্যে আছে মুর্শিদা বাউল গান , কেচ্ছা ও তার মাঝে মাঝে গান । কিশোর শুকদেবপুরের একটি মেয়েকে মালাবদল করে রাখে । শাস্ত্র মতে তাদের বিয়ে হবার ক্তহা ছিল । মালাবদলের পরই মোড়ল গিন্নি দুজনকে এক ঘরে রেখে বাইরে থেকে শিকল তুলে দেয় । আর একবার নৌকা করে বাড়ি ফেরার পথে নৌকায় তাদের মিলন হয় ।রাত পোহালে তিলক দেখল তিলক ,সুবল ও কিশোরের পা বাঁধা । ছইয়ের ভিতরে নববধূ নেই। ডাকাতরা তাকে তুলে নিয়ে যায় ।' হায় ,কি হইল রে' ১৩ বলে কিশোর পাগল হয়ে গেল । বছর চারেক পর অনন্ত যাত্রা করল তিতাস নদীর তীরে এক গ্রামে যেখানে তার বাবা থাকে । তার দুই দাদু নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গসুন্দর তাদের পৌঁছে দিতে এসেছে । যেভাবে তিন বছরের একটি শিশুর অনুভূতি-দেশকে লেখক অঙ্কণ করেছেন তা কি সত্যই সম্ভব ? ''সে নীরবে মার বাহুর বেড়ায় বাঁধা পড়িল । কিন্তু তখন তার মন ছিল মার দিকে না ছিল দাদাদের দিকে । নৌকাখানার অস্তিত্ব পর্যন্ত সে ভুলিয়া গেল ।তার চোখের সামনে জাগিয়া রহিল শুধু একটা নদী ।সে নদী তার সকল সত্তাকে , সারা অনুভূতিকে ,লতাতন্তুর মতো টানিয়া লইয়া চলিয়াছে .''১৪ তার প্রকৃত যাত্রা এখান থেকে শুরু হ'ল।

গ্রামের মেয়ে যে ছিল কিশোরের প্রণয়িনী বাসন্তী তার বিয়ে হ'ল সুবলের সঙ্গে । গগণ মালোর ছেলে সুবলও মাছ ধরতে গিয়ে মারা যায় । বাসন্তীর নতুন নামকরণ হল সুবলার বউ । নিজের নামের অস্তিত্বটুকু হারিয়ে যায় মালো সম্প্রদায়ে – স্বামীর পরিচয়েই তার পরিচয় । গ্রামের মালোদের সাধারণ স্তরের লোকেরা মাতব্বরের অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় অনেকে একসঙ্গে কেশে । ঔপন্যাসিক সুবল বাসন্তীর সম্পর্ক বর্ণনার সময় ফ্ল্যাস ব্যাক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন । সুবলার বউ ,সুবলার মৃত্যু ঘটনার বর্ণনার পর সুবল ও বাসন্তীর বিয়ে ঠিক হবার ঘটনা বর্ণনা করেছেন । মেঘনা নদীতে জিওলের ক্ষেপ দিতে গিয়ে নৌকার তলায় চাপা পড়ে সুবল মরেছে । বড় মর্মান্তিক সে মৃত্যু । কিশোর ও সুবলের কাহিনী বাসন্তীর মুখে শোনার পর অনন্তর মায়ের মুখ দেখে বাসন্তীর মনে হয়েছে নয়া গাঙের বুকে যাকে ডাকাতে নিয়ে গেছে এ সেই । দোল পূর্ণিমায় অনন্তের

মা পাগল কিশোরকে রাঙিয়ে তোলে । সুবলার বউ আর অনন্তের মা অনন্তকে মানুষ করে তোলার পরিকল্পনা করে । সুবলার বউ এর মত অনন্তের মা সধবা না বিধবা তাও অনন্তের মা জানে না । তার যে বিয়ে হয়েছিল কিন্তু স্মাজ স্বীকৃত বিয়ের সুযোগ অনন্তের মায়ের হয় নি । এই অনন্তের মায়ের কোন নাম নেই । অনেক নারী চরিত্রই কারো না কারো 'বউ' হিসেবে পরিচিত যেমন মঙ্গলার বউ ,সুবলার বউ । কয়েকটি পরিবার নিয়ে মালোদের সমাজ গড়ে ওঠে ।কায়েতরা মালোদের ছোঁয় না । ''মালোরা কোনো জিনিস ছুঁইলে সে জিনিস তারা অপবিত্র মনে করে । পূজা পার্বণে মালোরা তাদের বাড়ির প্রসাদ খাইলে এঁটো পাতা নিজে ফেলিয়া আসতে হয় ।''১৫ মালোরা সবচেয়ে বেশি উল্লাস পায় বিয়েতে ।জন্মের দুদিন পর সন্তাঙ্কে তারা তিতাসের জলে স্নান করিয়ে প্রণাম করিয়ে আনে ।সুবলার বউ তার জীবন কাহিনী বর্ণনা করেছে যেভাবে তাতে সুবলার বউ এবং অনন্তের মা নিজেরা বুঝেছিল এই কাহিনীর নেপথ্য নায়িকা তারা নিজেরাই ।নয়া গাঙে কিশোর তার স্ত্রীকে হারিয়ে হঠাৎই পাগল হয়ে যায় –আর সুবলেরও মৃত্যু ঘটে নদীতে জিওলের ক্ষেপ দিতে গিয়ে ।মাছের অপলক দৃষ্টি যেন যমদূতের মত মানুষগুলোকে টেনে নিয়ে যায় মৃত্যুর গহীনে । অনন্তের মা যেভাবে পাগল কিশোরের জন্য পাগলিনী হয়েছে , তার সেবা শুশ্রুষা করে তাকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে সেটাও যেন খানিকটা সাহসিকতার পরিচয় দেয় ।সুবলার বউও একসময়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তার বাবা মা তথা সমাজের বিরুদ্ধে ।যখন তার বাবা মা অনন্তের বউ-এর কাছে যাওয়া নিষেধ করেছে তখন সে বলেছে

আমি ময়নার সাথে কথা কমু , তার সাথে পুরীর বাইর হইয়া যামু ... আমার তিন কুলে কারুর লাগি ভাবনা নাই । একলা গতর আমি লুটাইয়া দেমু,বিলাইয়া দেমু , নষ্ট কইরা দেমু , যা মনে লয় তাই করুম , ...সেই অবুঝ-কালে ধর্মে কাচা রাড়ি বানাইয়া থুইছে ... তোমরা কি বুঝবা আমার দুঃখের গাঙ কত গহীন। আমার বুঝি সাধ আহ্লাদ নাই ।আমার বুঝি কিছুর দরকার লাগে না .১৬-

যারা অনন্তর মাকে চিনত সেই সউবল ও তিলক এখন স্বর্গে –তাই অনন্তের মা চায় কিশোর না চিনেই তাকে ভালবাসে ফেলুক । তাছাড়া 'দেশে দেশে একটা কথা উঠিয়াছে বিধবাদের বিবাহ দেও পুরুষ যদি বউ মরিলে আবার বিবাহ করিতে পারে , নারী কেন স্বামী মরিলে আবার বিবাহ করিতে পারিবে না ।''১৭ যে অনন্তর মা অনন্তর পিতৃপরিচয় খুজে পাবার আশায় কিশোরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে ,এমনকি অনন্তকে তার সত্যকার পিতৃপরিচয়ের কাহিনি শুনিয়ে রাখতে চায় যাতে অনন্তও তার মা সম্পর্কে গর্ববোধ করে । আবার এক হোলি উৎসবে পাগল কিশোর তার স্মৃতিশক্তি ফিরে পায় । কিশোর যখন তার স্ত্রী অনন্তের মাকে চিনতে পারল সে স্বাভাবিক হয়েছিল কিন্তু পাড়া – প্রতিবেশী বুঝতে না পেরে কিশোরকে এত মারে যে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া কিশোর আর ঘরে যেতে পারে নি । শেষবারের মত সে স্বাভাবিক কথা বলেছিল ''বাবা , আমারে একটু জল দে ... বাবা , আমারে ঘরে নে ; আমি উঠতে পারি না ''১৮ কিশোর কোনরকমে রাত্রিটা বেঁচেছিল , পরের দিন ভোর হওয়ার আগেই মরে গেল ।আর অনন্তের মা মরল তার চারদিন পর ভোর হওয়ার পরে । এবার গ্রামের লোক অনন্তের মার চিতাতে আগুন দিতে দিতে বলল ''পাগলে মানুষ চিন্যাই ধরছিল । চাইর দিন আগে মরলে এক চিতাতেই দুজনারে তুইল্যা দিতাম । পরলোকে গিয়া মিল্যা যাইত । ''১৯ নায়ক নায়িকার মৃত্যুই যেহেতু এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয় নয় তাই তিতাসের কথায় আবার ফিরে আসেন লেখক ।

কাদির মিঞার আলু বোঝাই নৌকা মালোর পুত ধনঞ্জয় ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচায় । ঔপন্যাসিক হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটা সমন্বয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন ।কাদির যে হাটে আলু বিক্রি করে সে হাটেই অনন্তকে বনমালী দেখতে পায় । অনন্ত হাটে আসে ফেলে দেওয়া পান ,আলু কুড়াতে । বনমালীর বোন লবচন্দ্রের বউ অনন্তকে আশ্রয় দেয় । লবচন্দ্রের বউ উদয়তারাকে দাদা বনমালী নিয়ে যায় বনমালীর বাড়ি নবীনাগরে – সঙ্গে গেল অনন্ত । অনন্তের অনন্ত যাত্রা শুরু হ'ল এখান থেকে । তিতাসের মত অনন্ত তার যাত্রা ।তিতাস রাক্ষুসী হয়ে মালোপাড়া গ্রাস করতে শুরু করেছে । চাষের জমিও জলে ঢাকা । তিতাস যেহেতু মালো পাড়ার কাছে এসে পড়েছে , সুবলার বউ অনন্তকে মনে করছে ,আজ অনন্ত কাছে থাকলে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে দুটো পেট দিব্যি চলে যেত । অসহায়া নারী শিশুকেও তার বাঁচার আশ্রয় হিসেবে দেখছে । অনন্ত জল - বিছানায় শোবার কথা কল্পনা করে ।উদয়তারা তখন তাকে মনসামঙ্গলের লখাই পন্ডিত অর্থাৎ লখীন্দরের কথা বলে । অনন্তর আক্ষেপ কোন আখর না শিখে সে পন্ডিত হবে কি করে ? একই সঙ্গে লেখক মনসামঙ্গল , মহাভারতের যুধিষ্টির এমনকি হিমালয় পর্বত থেকে নদীর উৎপত্তির কথাও এনেছেন । শ্রাবণ মাসে বাড়ি বাড়ি পদ্মপুরাণ গান হয় । এখানেই স্থির হয় মালোর পুত অনন্তকে লেখাপড়া শেখানো হবে । তার কৈশোর জীবনে এক প্রেয়সীও আসে নাম তার অনন্তবালা । অনন্ত বোঝে একমাত্র মাকে সে আপন বলে জানে । তারপর মাসী সুবলার বউ , এখন উদয়তারা – এরা তার কেউ নয় – তাড়িয়ে দিলে একটা পান্থশালা ঠিক জুটে যাবে । সে বোঝে ''অতীতের সঙ্গে তার বর্তমানের যে যোগসূত্র আছে ,ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াইয়া সে সূত্র ছিন্নবিচ্ছিন্ন ।একটা নগণ্য খড়কুটার মতই সেও সময়ের মহাস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে ।তিতাসের বুকে হাজারো খড়কুটা ভাসিয়া যায় ; কিন্তু কোন না কোন মালোর জালে তারা আটকা পড়িবেই পড়িবে ।''২০ ব্রাহ্মণদের জাত কি সহজেই চলে যায় তা দেখিয়েছেন- ভুঁইমালিয়ার হাতে জল খেলেই ব্রাহ্মণের জাত চলে যায় ।

তিতাসের বুকে নৌকা –দৌড় খেলা হয় ।তার দুই পাড় ঘেঁষে হাজার হাজার ছোট বড় নৌকা খুঁটি বেঁধে থাকে । শেষবেলার দিকে প্রতিযোগিতা শুরু হবে । প্রত্যেক নৌকায় গান শুরু হয়েছে । মালোদের কাছে এ এক মহা উৎসব ।এ সময়ই সুবলার বউ অনন্তকে খুঁজে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধ'রে জানতে চায় কে তাকে খেতে থাকতে দিয়েছে ? উদয়তারা এ ধরণের কথায় জ্বলে উঠল । হঠাৎ সুবলার বউ তার স্নেহের অনন্তকে মেরে পাটাতনে নেতিয়ে ফেলল । উদয়তারা সহ্য করতে না পেরে আরো কিছু সঙ্গিনী নিয়ে এত মারল যে সুবলার বউ আর মুখ তুলে তাকাতে পারল না । ফিরে গেল সুবলার বউ । অনন্ত লেখাপড়া শিখতে শুরু করেছে । নাপিতানীর পরামর্শ সে যেন দূরের শহরে চলে গিয়ে পরের মাকে মা ডাকে তবেই সে খেতে পড়তে পারবে আর অনেক বইয়ে অনেক কথা জানতে পারবে ।একদিন মালোদের একতায় ভাঙন ধরল সেদিন থেকেই মালোদের দুঃসময়ের শুরু । মালোপাড়ায় যাত্রাগান এল মালোরা সম্মোহিত হয়ে পড়ল যাত্রাগানের চাকচিক্যে । শুধুমাত্র সুবলার বউ আর মোহন মালো-গানের প্রতি শ্রদ্ধায় যাত্রা গানের রস উপভোগ থেকে বিরত রইল । কিন্তু শেষে দেখা গেল মালো মেয়েদের অন্তপুরের শুচিতাও নষ্ট হয়ে গেল । মেয়েদের বিলাসিতা খুব বেড়ে গেল । তাদের অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হ'তে লাগল । শেষে ঋণদান কোম্পানির শাখা থেকে মালোরা টাকা ধার করেছিল । সে টাকা শোধ দিতে তাদের ঘটি বাটি সব যায় । আবার তিতাস প্রসন্ন হয় । নূতন নূতন

জাল তৈরী হয় । সে জালে নানা জাতের মাছ পড়ে । কিন্তু বছর ঘুরতেই তাদের ফিরে পাওয়া হাসি আবার মিলিয়ে গেল ।

এই পাড়ারই রাধাচরণ মালো স্বপ্ন দেখেছিল তিতাসের বুকে চর ভাসছে । তারা একদিন সত্যি সত্যি দেখল ‘‘হিসাবে মেলে না , কোথায় যেন গোলমাল হইয়া গিয়াছে ।তারা বহু পুরুষ ধরিয়া এই নদীর সঙ্গে পরিচিত । তাদের দিনে রাতের সাথী বলিতে এই নদী ’’২১ ভাঁটার শেষদিনে মোহনের জালের খুঁটিতে ধরা পড়ল সেই চর ।মোহন বাড়ি এসে জানাল ‘গাঙ শুখাইছে’ বড় বড় নদীতে এক তীর ভাঙে , অপর তীরে চর পড়ে । এটাই ধর্ম । কিন্তু তিতাসের ধর্ম তা নয় । এ নদীর কোন তীরই ভাঙে না ।কাজেই তার বুকে যখন চর পড়ল সে চর দিনে দিনে জাগতে থাকে আয়তনে বেড়ে । বর্ষাকালে জল বেড়ে তিতাস কানায় কানায় পূর্ণ হল ।বর্ষা অন্তে সে জল সরে যাওয়াতে সেই চর বুক চিতিয়ে দিল । কোথায় গেল এত জল ,কোথায় গেল তার মাছ ? তিতাসের শুধু দুই তীরের কাছে দুটো খালের মত সরু জলরেখা প্রবাহিত রইল । তিতাস যে এককালে একটা জলভরা নদী ছিল তারই সাক্ষী হিসাবে । এই জায়গা যতদিন জলে ডোবানো ছিল ততদিনই ছিল মালোদের ,যেই জল শুকিয়ে চর ভেসে উঠেছে তখন হয়ে গেল চাষাদের ।মালোদের এই অসহায় অবস্থা ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন বড় মর্মস্পর্শী ভাষায় ।

এখানে তারা বীজ বুনিবে ,ফসল কাটিয়া ঘরে তুলিবে ।তাদের এ দখল চিরকাল বর্তাইয়া রহিবে , কোন্দিন কেউ এ দখল হরণ করিয়া লইবে না । তাদের এ দখল যে বাস্তবের উপর ,তা যে মাটির গভীরে অনুপ্রবিষ্ট । আর মালোদের দখল ছিল জলে ; তরলতার নিরালম্ব নিরবয়বের মধ্যে । কোনোদিন সেটা বাস্তবের গভীর স্পর্শ খুঁজিয়া পাইল না । পাইল না শক্ত কোন অবলম্বন । কঠিন কোন পা রাখিবার স্থান । তাই তারা ভাসমান । পৃথিবীর বুকে মিশিয়া যতই তারা ,জেলেরা গাছপালা বাড়িঘরের সঙ্গে মিতালি করুক , তারা বাষ্পের মত ভাসমান । ... জল শুখাইলে তারা জলের সঙ্গে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় । ২২

নদীর চর দখল করল তারা যারা অনেক জমির মালিক । ভূমিহীন কৃষকরা লাঠালাঠিতে পেরে উঠল না । রামপ্রসাদ একাই গিয়েছিল জমির দখল নিতে – না পেরে মৃত্যুবরণ করল । নবীনগর গ্রামেও চর এসে উপস্থিত হ’ল । অনন্তবালা অনন্তের অপেক্ষায় বসে আছে । অনন্তবালার বাবা বাবা বনমালীকে রেলের ভাড়া দিয়ে কুমিল্লা শহরে পাঠাল । বনমালী অনন্তকে দেখল পরনে ফর্সা ধুতি , ফর্সা জামা ,পালিশ করা জুতা পরে আরো তিনজনের সঙ্গে তর্ক করছে । বনমালী সামনে যেতে না পেরে মাছের পোনার হাঁড়িতে মুখ রেখে জানায় তিতাস শুকিয়ে গেছে মালোরা জলছাড়া মীনের মত হয়ে গেছে । খেতে পায় না । অনন্ত উদয়তারা আর সুবলার বউ মাসীস জন্য কাপড় কিনে পাঠাল । উদয়তারার স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে । উদয়তারা স্বামীর গ্রামে ফিরে এসে বাসন্তীকে অনন্তর খবর দিল । একে একে মালোরা নিস্তেজ হয়ে পড়ল । শেষ শয্যা নেবার আগে বাসন্তী লোটা নিয়ে তিতাসে গেল জল আনতে – কারণ শেষ সময়ে কে দেবে মুখে এক ফোঁটা জল ? অনন্তবালা তার বাবা কাকার সঙ্গে চলে যাচ্ছে আসামে । অনন্তবালার কাছে বাসন্তী অনন্তর কথা সব জানল সে গ্রামে গ্রামে সমাজসেবা করে বেড়াচ্ছে । কিন্তু পাড়াতে আর কেউ বেঁচে নেই ,কেবল রামকেশব আর সুবলার বউ বাসন্তী । বৃদ্ধ রামকেশব একটা মাটির সরা নিয়ে টলতে টলতে এসে দাঁড়ালে

তাতে ভাত তুলে দেয় অনন্ত ,কিন্তু বাসন্তী গেল না ।অনন্তের অধিকার আর সে দাবি করে না ।তিতাসে আবার জল আসে ,কিন্তু মালোপাড়া আর নেই ,শূণ্য ভিটাগুলিতে গাছ গাছড়ায় যে বাতাস বয় তাতে যে মৃত মালোরা নিঃশ্বাস ফেলে ।যে তিতাসকে আশ্রয় করে মালোদের জীবন ছিল ,তিতাস রইল কিন্তু মাঝের চর মালোগুষ্টিকে গিলে ফেলেছে । যে নদী তাদের জীবন দিয়েছিল সে নদীই একে একে তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করেছে ।

নদীকেন্দ্রিক আরেকটি প্রণিধানযোগ্য উপন্যাস সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'(১৯৫৭) । নৌকা মহাজনের কাছে ভাড়া নিয়ে হলেও মাছমারা জেলে আসবে গঙ্গায় মাছ মারতে । সমরেশ বসু বলছেন ''এ মিঠে জলের টান ,বড় টান । যদি দেয় তো গঙ্গাই দেবে হাত ভরে না দিলে মরণ।'' ২৩ বিষ্ণু দে যেমন বলেছিলেন ''গঙ্গায় আপনার যাত্রা , আপনাকে সাগরসঙ্গমে দেখতে চাই ''।২৪ এই উদ্ধৃতিকে স্মরণ রেখে এ উপন্যাস সম্পর্কে বলাই যায় সাগরেই তিনি পৌঁছে দিয়ে গেছেন তেঁতলে বিলেসকে । পাঁচু আর নিবারণ দুই ভাই মাছ ধরতে যায় । দাদা নিবারণ সাঁইদার অর্থাৎ সে অনেক গণ্ডা নৌকাকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যায় সাগরে মাছ ধরতে ।তার ওপরে নিবারণ গুণিন । দক্ষিণ রায় অর্থাৎ বাঘের মায়াবি জালে পড়ে প্রাণ হারায় অনেক মাছমারা । তাই ভাই পাঁচুকে সাগরে যাবার ও পথের সমস্ত প্রতিকূলতা সম্পর্কে সচেত্ন করে দেয় । উপন্যাসের কাহিনি পরম্পরায় ফ্ল্যাসব্যাক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন লেখক । ঘরে গর্ভবতী স্ত্রী রেখে নিবারণ মালো গেছে সাগরে সেখান থেকে পাঁচু আর তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে নি । ঘরে বসে নিবারণের বুঝতে পেরেছিল যে তার স্বামী আর ফিরবে না পরে পাঁচু বর্ণনা করেছে কিভাবে রহস্যজনকভাবে তার দাদা নিবারণ হারিয়ে গেল চিরকালের জন্য –''সুঁদুরির ঠাসাঠাসি , নেলো, বিষকাটারি আর বাসক ঝাড়ে বাতাসের ক্রুদ্ধ শাসানি । অশেষ আকাশ এখানে শাসিত , নির্বাসিত অসূর্যম্পশ্যা এই অরণ্যে মেঘে মেঘে নেমেছে সন্ধ্যার ঘোর । ... কিন্তু কোন চিহ্ন নেই ।খাল শেষ হয়ে এল ,বন হলো আরো গভীর । মানুষটা নেই ।''২৫ মালোদের বাঁচা মরা এত সহজভাবে লেখক বর্ণনা করেছেন যে জীবন ও মৃত্যুর মাঝে দূরত্ব খুব বেশি নয়। '' যদি মাছমারা হও ,তবে মাছের পিছে পিছে আসতে হবে । তার মরণ তোমার জীবন ।এই নিয়ম। জীবন মরণের পাশাপাশি বাস ''২৬ দাদা নিবারণের মৃত্যুর সাত বছর পর নিবারণের বড় ছেলে বিলাসকে নিয়ে পাঁচু যায় গঙ্গায় মাছ ধরতে , মাছমারাদের জীবনে 'টোটা' অর্থাৎ মন্বন্তরের অভাব নেই তার ওপর আছে সুন্দর বনের বাঘ এবং ডাকাত দল । জীবন বিপন্ন করে তারা ছুটে যায় মাছ মারতে আর মৃত্যু তাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে হোগলা – সুঁদুরির রহস্যময় পরিবেশে ।একবার তো কুড়িগন্ডা নৌকা ,নৌকা পিছু তিন জন মাছের চক ধাওয়া করে গিয়ে পৌঁছেছিল হয়তো মাঝ –সমুদ্রে –আর কেউ ফেরে নি । লেখক তাই তাদের এই বিপন্ন জীবনকে তুলে ধরেছেন এমনভাবে ''তুমি মারো মাছ ,তোমাকে মারেন আর একজন । সংসারের নিয়ম । কুড়ি গন্ডাটা ব্যতিক্রম , তবে মাছমারাদের কাছে ব্যতিক্রম নয় । তার মরণের লিখন একটু অন্যরকম হয় । যার সঙ্গে তোমার বাস ,যে তোমার শ্বাস ,সেই মাছের সঙ্গে তোমার মরণের সুতো গাঁথা হয় ,বাইরে মর আর ঘরেই মর। নিদেনকালে একবার রক্তমাখা মীনচক্ষুর সঙ্গে চোখাচোখি হবে তোমার ''২৭ মাছমারাদের মৃত্যু লুকিয়ে থাকে মাছেরই ঝাঁকে ,গহীন আশ্রয়ে ওত পেতে থাকে । তেঁতলে বিলেস একটু বেপরোয়া । মহাজনকে খাতির করে কথা বলতে সে পারে না । মহাজন যদি টাকা

ধার নাই দিতে পারেন তাহলে তিনি মহাজন হয়েছেন কেন মাছ হয়ে জন্মালেই পারতেন । মালোরা নাকি পতিত হয়ে গেল গুরুদেবের পায়খানার জল এগিয়ে দেয়নি বলে । সেই মালোর ঘরের ছেলে বিলাস বেপরোয়া । অজানার প্রতি মানুষের কৌতূহল চিরন্তন । লেখক বলেছেন যার তুমি সবটুকু দেখ নি ,জান না ,সেই দিকেই তোমাকে টানে । তার দিকেই বার বার তুমি চোখ তুলে তাকাও । যাবৎ সংসার যখন ঘুমায় ,তখন মাছমারার বউ-ঝিয়েরা জাগে ।এটাই নিয়ম । তারা জাগে বারোমাস । যখন উত্তাল তরঙ্গের বেশে , ঘূর্ণির ছদ্মবেশে ,ঝড়ে রুদ্র দাপটে ঘিরে ধরে মাছমারাকে ,তখন ঘরে জাগে সতর্ক দৃষ্টি । মীন যাকে ছিনিয়ে নেবে নদীতে ,তার প্রথম হ্যাঁচকা লাগবে এই ঘরে । কেননা সে মাছমারার বউ । উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে বিপন্ন মাছমারা যখন অসময়ে মাছ পায় না পেটের তাগিদে তারা চাষাবাদও করে । মাছমারাদের নামের বিলাসিতা নেই । তাই একাধিক বিলাস ,একাধিক পাঁচী । তাই নিবারণের ছেলে তেঁতুলতলার তেঁতলে বিলেস আর তার প্রেমে পড়েছে গাম্ লি পাঁচী । কিন্তু অমর্তের বউ এর আহ্বানও সে অগ্রাহ্য করতে পারে নি । তাই এক দুপুরে অমর্তের বউকে ছুবলে এল বিলাস । তার মধ্যে অপরাধবোধ তাকে কুরে কুরে খায় সয়ারামের কাছে সে স্বীকার করেছে । মহাজনী কারবারকে দৃঢ় ভাষায় ধিক্কার জানিয়েছে বিলাস – ''তার চে ঋণ নেব না , আমাকে ঋণ দে তো মহাজন খায় ।আমি যদি ঋণ না নে' না খেয়ে মরি ,মহাকনে বাঁচে কমনে ? ঋণের জোরেই তো ?''২৮ মহাজনেরা বোঝে না মা গঙ্গার বুকে থেকেও তাদের এত পেটের জ্বালা হয় কেন ? বিলাস বলে ওঠে –''বললে না কেন মহাজনকে তুমো চল ,গঙ্গার পুণ্যির বাতাস খেলে পেট জ্বকে কিনা জ্বলে , এট্টু ঠাওর করে আসবে ।''২৯

গঙ্গার ফড়েনী দামিনীর সাথে বংশ পরম্পরায় নিবারণের কারবার । ফড়েনীরাও টাকা ধার দেয় । বিনিময়ে মাছ দিয়ে ধার শোধ করে তারা । দামিনীর এক নাতনি আছে হিমি । টানাছাঁদি , সাংলো এগুলো বিভিন্ন রকমের জাল বিভিন্ন সময়ে মাছ ধরার । জাল ফেলা নিয়ে মাছমারাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে যায় । উজানে অর্থাৎ জোয়ারে সাগর থেকে আসবে মাছ আর যত নৌকা সাবধান করতে হবে তত গঙ্গার কাল মাছমারাদের সহায় হবে। জলেঙ্গা জল দেখে আনন্দে মেতে ওঠে মাছমারারা । প্রথমবার জাল ফেলে দুটি ইলিশ ,একটি ভোলা আর গোটাকতক রূপালী খয়রা মাছ উঠল । বড় ইলিশের গড়ন পাঁচুর চোখে আঁটোসাটো যুবতী মেয়েমানুষটির মত ।গঙ্গার ধারে শ্মশানে যে সন্ন্যাসী সে শবদেহের অপেক্ষায় বসে থাকে বিলাসের চোখে শ্মশানের কুকুর আর সাধুবাবাজী হ'ল মড়া - খেকো । আর আছে গঙ্গার ধারে মেয়ে- পাড়া বাঁ মেয়েদের বাজার মেয়েমানুষ নিজের অঙ্গ বিকোয় ওখানে । মানুষের অঙ্গ ।একজন বিকোয় পেটের দায়ে – মানুষ কেনে মাছের মতো । মাছমারাকে তার ঘরেও যেতে হয় না । গঙ্গার পাড়েই , ফাঁকা নিরালায় নগদ বিদায় হয় ।দামিনী ছিল বাজারের তেমনি মেয়েমানুষ। কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে দামিনী ছিল আশ্বিনের গঙ্গা । দেহের স্রোতে নাবালেরই ঢল । দামিনীর মেয়ে কাঁচা বয়সে 'বেধবা' হয়ে রাঁড় হয়েছিল – তারই মেয়ে হিমিকে দেখে চোখ ফেরাতে পারে না বিলাস । আর এক ফড়েনী আতরবালা । দুলাল তার স্বামী নয় , আতরবালার মানুষ । বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে লেখা উপন্যাসে লেখক যেভাবে আতরবালা ও দুলালের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখিয়েছেন তাকে 'লিভ টুগেদার' ছাড়া আর কিছু বলা যায় না । দামিনীর নাতনি হিমি চুঁচুড়োয় এক বাবুর কাছে কিছুদিন থেকে ফিরে এসেছে

মন টেঁকে নি । দামিনী তাই বলে ''সোমসারে মনের মানুষ সবাই খুঁজে মরে ।তাকে কি পাওয়া যায় ? যায় না কখন বয়স ঘুচে যায় , মরণ আসে , তার কোলে গিয়ে জুড়োতে হয় ।''৩০ হিমির সঙ্গে বিলাসের মন দেওয়া নেওয়ার পালা চলে বেশ সুন্দরভাবে । গঙ্গার বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রূপ ,জলের রং কি কারণে বদলে বদলে যায় তা লেখক তুলে ধরেছেন । উপন্যাস পাঠকালে মনে হয় লেখক নিজেই কোন এক নৌকায় সওয়ার হয়েছেন । পাহাড়ের জল ভাঙলে জলের রং লাল । এই প্রকৃত গঙ্গা । এই গঙ্গা দেখতে বড় শান্ত । কোলে তার সবাই মরতে চায় ।বর্ষার মরশুমে গঙ্গার সব ক্ষুধার এক ভোগ্য হ'ল মানুষ । আর সামুদ্রিক ঝড় যাকে মাছমারারা দানো বলে তাতে যায় কিছু মাছমারার প্রাণ । সমুদ্র উপকূলের কাঠ চুরি করতে তারা যায় না – তাদের প্রাণ পড়ে থাকে অগাধ জলের তলায় । এমন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ভরা কোটালে বর্ষার পূর্ণিমায় জল বাড়া রাতে সবচেয়ে বেশি এবং এই জোয়ারেই মাছ উজানী ঢেউয়ে এসে ঢোকে গঙ্গায় ব্যক্ত করেছেন যা থেকে লেখকের দরদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে । অমাবস্যায়ও জোয়ান কোটালের জোর থাকবে , দ্বিতীয়া পর্যন্ত টান- কাঁপানি থাকে । একেবারে চরমে উঠে চতুরর্থীতে ঢিল দেবে । দিতে দিতে অষ্টমীতে গিয়ে বাঁধন আলগা হয়ে যাবে । দশমীতে একেবারে শেষ ।ইলিশের প্রকৃতি হ'ল জোয়ার ঠেলে যায় সমুদ্রে আর ভাটা ঠেলে আসে সমুদ্র থেকে । উজান তার বাঁচা । সে তখন একটানা ভাসবে ,যখন মরবে । এই মাছমারার মতন । গঙ্গার তীরে মোটর লরি দাঁড়িয়ে থাকে না । তাই মাছ বেশি পেলেও জ্বালা । কম দামে মহাজনের কাছে বেচতে হয় নইলে পচন ধরে। কিন্তু তবু মাছের চক দেখে স্থির থাকতে পারে না তারা তাই মাছ ধরা থেকে তারা ইব্রত থাকে না । মাছ ধরার মাঝেই চলছে হিমির কাছে বিলাসের মন দেওয়ার পালা । কাকা পাঁচু সহ্য করতে পারছে না তার ভাইপোর এই বিশৃঙ্খল মানসিক অবস্থা ।যতই বিলাস হিমির প্রেমে পড়ুক তবু তার মন ডাক শোনে সাগরের । ''আমার ডাক পড়েছে সাগরে ,/ঠাকুর , আমার যেতে মন করে ।''৩০ শ্রাবণের জোয়ান কোটালে জগন্নাথ ঠাকুর রথের চাকা ধুয়ে দাগ রেখে গেছেন। এবার কৃষ্ণ আসছেন ঝুলন খেলায় । নীপবনে আসবে কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে । উত্তরে বন্যা নেমেছে তাই গঙ্গার লকলকে জিভ মাছমারাদের গিলে ফেলতে চায় । তাই মাছমারারা অনশণ করেছে আবার পশ্চিম পারের মাছমারারা বাঁধাছাঁদি জাল পেতেছে –বিশাল বেড় –বাঁধে গঙ্গার এপাড় ওপাড় জুড়ে । টানাছাঁদি বা সাংলো কোন জাল ফেলেই আর কেউ মাছ ধরতে পারবে না । তাই বিলাস রসিককে জলের তলায় বুক দিয়ে চেপে ধরে ,পাঁচুর ডাকে ছেড়ে দেয় ।শ্রাবণ টোটায় মাছমারাদের দুর্দিন ঘনিয়ে আসে । পাঁচু জ্বর শরীরে সাংলো জাল ফেলেছিল । কিন্তু আর তার জাল ফেলা হবে না ,কারণ দক্ষিণ থেকেতার দাদা নিবারণ এসেছে আর এসেছেন মীনেরা – মাছমারার এ মরণ ভালো । যত মাছ সে মেরেছে সবাই এসেছে তাকে নিতে । পাঁচু বিলেসকে বলে সে টানের সময় সাঁই নিয়ে সেন যায় সমুদ্রে ।আর দামিনীর লাতিন হিমি তাকে ভালবাসে এটা পাঁচু বুঝেছে । মানুষ মাছ-ভাত খাবে সে যেন মাছ মারে আর যেন দুধে-ভাতে খায় । কঠিন বিলাস চিৎকার করে উঠল কেমন করে তার খুড়ো তাকে ছেড়ে যাচ্ছে ? পাঁচুকে বুকে চেপে হাঁটুতে নিয়ে বিলাস এই প্রথম হালে বসল । পাঁচু প্রথম প্রহরের শেয়ালের ডাক ,হুতোম প্যাচার ডাক শুনতে পাচ্ছে ।''পাঁচু তোমাদের ছেড়ে যায় । বিলেস ...বা-বা-বি-লে-স ...'' বিলাস আর সাড়া দেয় না । বিলাসকে মা গঙ্গার হাতে রেখে পাঁচু বিদায় নেয় ।এমন অসাধারণ মৃত্যুদৃশ্য বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি নেই ।

কেদমে পাঁচুকে ডেকে বিলাস কত সহজভাবে বলে ''একবারটি ইদিকে এস ,খুড়ো আমার মরে গেল ।''৩১ কেদমে পাঁচু অন্য নৌকায় চিৎকার করে খবর দেয় ''ধলতিতের পঁচানন মালো মারা পল হে-এ-এ-এ''৩২

বিলাস হিমিকে নিয়ে যাত্রা করল বাড়ির উদ্দেশ্যে । মেয়েপাড়ায় এসব নিয়ে বড় রকমের আন্দোলন হয় না চলতি সমাজ জীবনের বন্ধন এদের সমাজে নেই ।কিন্তু সমাজ আছে একটা ।কতকগুলি রীতিনীতি আছে ।দামিনীর স্বামী অল্প বয়সে মারা গেছে ।তার পরেও তার যৌবন ছিল ।পিরীত হয়েছে , ঘর করেছে আর একজনের সঙ্গে ।সে যদি চলে গেছে আর একজনও হয়ত এসেছে । এমনি করে স্বাধীন হয়েছে । যৌবন থাকতে যেন এখানে বৈধব্য নেই । এখাঙ্কার স্মাজ এরকম । মহাসাগর যাকে ডাক দিয়েছে হিমি তাকে ধরে রাখবে কোন বাঁধনে ? তাই বিলাস যখন অকূল সমুদ্রে যাবে হিমির প্রাণ পুড়বে ঘরে বসে তার নাগাল তো হিমি পাবে না –তাই সে ফিরে যাবে দিদিমা দামিনীর কাছে । শেষ বিদায় নেবার সময় বিলাস বলে গেল ''জোয়ারের আগনায় আসব তোমার কাছে চলন্তায় যাব অকূলে । তখন যেন তোমার দেখা পাই ।''৩৩ আঠারো গণ্ডা নৌকা নিয়ে সাঁইদার তেঁতলে বিলাস সমুদ্রে যায় । অসামান্য সমাপ্তি ।

নদীকেন্দ্রিক এই তিনটি উপন্যাসে মাছমারা সম্প্রদায়ের আনন্দ-বেদনা , সুখ-দুঃখ ,হাসি কান্না সব নিয়ে স্বমহিমায় বাংলা সাহিত্যে বিরাজ করছে । 'পদ্মানদীর মাঝি'তে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপের আহ্বানে কুবের যেতে বাধ্য হয়েছে ।'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে তিতাস শুকিয়ে যাওয়ায় মাছমারারা অঘোরে মরেছে । অদ্বৈত মল্ল বর্মণ তাদের প্রতিনিধি অনন্তকে শিক্ষিত করে বৃহৎ জগতের মাঝে নিয়ে দাঁড় করিয়েছেন । সাগর যাকে ডাকে অন্তরে ,ঘরে তাকে বেঁধে রাখার চেষ্টা বৃথা- সমরেশ বসু এ সত্যকে প্রতিপাদ্য করে তেঁতলে বিলাসকে সাগরে পাঠান । উপন্যাসগুলির আত্মিক আবেদন পাঠককে বার বার উপন্যাস পাঠে বাধ্য করে । তিনটি উপন্যাসই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল ।

গ্রন্থপঞ্জীঃ-

১। বন্দ্যোপাধ্যায় , শ্রীকুমার 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লি ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কল ৭৩।

২। বন্দ্যোপাধ্যায় ,মানিক 'পদ্মানদীর মাঝি', ডঃ সমরেশ মজুমদার সম্পাদিত ,রত্নাবলী,১১ , ব্রজনাথ মিত্র লেন , কল ৯।

৩। ক্ষেত্র গুপ্ত 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' পঞ্চম খন্ড, গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১ বি পটুয়াটোলা লেন, কল ৯।

৪। ক্ষেত্র গুপ্ত 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' ষষ্ঠ খন্ড ,গ্রন্থ নিলয় ,৫৯/১বি পটুয়াটোলা লেন, কল ৯।

৫। অদ্বৈত মল্ল বর্মণ 'তিতাস একটি নদীর নাম'দে'জ পাবলিশিং , কল ৭৩।

৬।সমরেশ বসু , 'গঙ্গা' মৌসুমী প্রকাশনী, কল ৯।

তথ্যসূত্রঃ-

১ । 'পদ্মানদীর মাঝি' ,মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। তদেব।

৩। তদেব।

৪ তদেব।

৫। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬। 'তিতাস একটি নদীর নাম' পৃষ্ঠা ২২।
৭। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ।
৮। 'তিতাস একটি নদীর নাম' পৃষ্ঠা ২৬।
৯। তদেব পৃষ্ঠা ২৬ ।
১০। তদেব পৃষ্ঠা ২৯ ।
১১। তদেব পৃষ্ঠা ৩১।
১২। তদেব পৃষ্ঠা ৩৪ ।
১৩। তদেব পৃষ্ঠা ৪২ ।
১৪। তদেব পৃষ্ঠা ৬৯।
১৫। তদেব পৃষ্ঠা ৭৬।
১৬। তদেব পৃষ্ঠা ৯২ ।
১৭। তদেব পৃষ্ঠা ১২৭।
১৮। তদেব পৃষ্ঠা ১৩১।
১৯। তদেব পৃষ্ঠা ১৩৬।
২০। তদেব পৃষ্ঠা ১৩৬।
২১। তদেব পৃষ্ঠা ১৮৮।
২২। তদেব পৃষ্ঠা ২৪১।
২৩। তদেব পৃষ্ঠা ২৪২।
২৪। 'গঙ্গা' সমরেশ বসু , মৌসুমী প্রকাশনী , কল ৯, পৃষ্ঠা ১৫।
২৫।তদেব পৃষ্ঠা ক।
২৬। তদেব পৃষ্ঠা ১২।
২৭। তদেব পৃষ্ঠা ১৫।
২৮। তদেব পৃষ্ঠা ১৮।
২৯। তদেব পৃষ্ঠা ৫০।
৩০। তদেব পৃষ্ঠা ৫২।
৩১। তদেব পৃষ্ঠা ৯৩ ।
৩২। তদেব পৃষ্ঠা ১০৯।
৩৩। তদেব পৃষ্ঠা ১৬৩।
৩৪। তদেব পৃষ্ঠা ১৬৩ ।
৩৫। তদেব পৃষ্ঠা ১৯০।